ইউনিট ১৬

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

ভূমিকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নানা রকম টালবাহানা শুরু করেন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আহুত ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। পাকিস্তানি শাসক চক্র ও রাজনৈতিক দলসমূহের এরূপ ভূমিকার প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। প্রশাসনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার লক্ষে নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা দেন। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ইয়াহিয়া খান-ভুট্টো ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়ার নির্দেশে ঐ রাতে পাকিস্তান বাহিনী নিরীহ মানুষের ওপর ট্যাঙ্ক-অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এই ঘোষণার পর জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। তারপর দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নিকট পাক-বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন
- ➔ পাঠ ২ : ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ
- ➔ পাঠ ৩ : অস্থায়ী সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা
- ➔ পাঠ ৪ : মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাঠ-১ : ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ☞ ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১.১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ হঠাৎ করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঢাকাসহ সারা প্রদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

আওয়ামী লীগ ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ২ ও ৩ মার্চ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে (আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে ডাকসু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক) সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনসভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' নামক একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। ৩-৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে ২টা পর্যন্ত একটানা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সভায় সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং জনগণের দাবি না মানা পর্যন্ত খাজনা প্রদান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন। এই দিনই লে. জেনারেল ইয়াকুব খানকে প্রত্যাহার করে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

১.২ ৭ মার্চের ভাষণ

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ইয়াহিয়া খান ঘোষিত ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেন। শর্তগুলো হলো :

১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. অবিলম্বে সেনা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
৩. সকল প্রাণহানী সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে, এবং
৪. সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনগণকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং শত্রু মোকাবেলায় সম্ভাব্য প্রস্তুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তাঁর এ ঘোষণা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবুজ সংকেত হিসেবে কাজ করে। ভাষণে তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেন যা সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে।

৭ মার্চের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পাগল জনগণের সর্বাত্মক অসহযোগিতার কারণে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক শাসন চলতে থাকে। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারি করেন।

১.৩ ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো আলোচনা

৭ মার্চের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসনের আয়োজন করেন। ১৫ মার্চ তিনি ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় আলোচনা চলে। এক পর্যায়ে জুলফিকার আলী ভূট্টোকেও বৈঠকে ডেকে আনা হয়। ২১ মার্চ ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। ২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া-ভূট্টোর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য হলেও ৬ দফা প্রশ্নে ভূট্টোর সংশোধনী প্রস্তাব ও ক্ষমতার অংশিদারিত্ব দাবি আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে।

১.৪ আলোচনা ব্যর্থ ও ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ

আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে জনমনে সংশয় দেখা দেয়। তাই ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চললেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ২২ মার্চ ঢাকার সকল সংবাদপত্র 'স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা'র ছবি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস'। এই দিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঢাকার ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। কেবল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউজে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলিত হতে দেখা যায়। ২৪ মার্চ আলোচনার শেষ দিনেও কোন মতৈক্য হয়নি। উল্লেখ্য যে, এ আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে শাসকগোষ্ঠীর কোন ইচ্ছা ছিল বলেও মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য এবং অস্ত্র ও রসদ নিয়ে আসাই ছিল পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য। প্রয়োজনীয় সৈন্য ও রসদ আসার পর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি সেনা বাহিনীকে বাংলার নিরস্ত্র জনতার উপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। ফলে শুরু হয় ইতিহাসের এক ভয়াবহ নির্মম গণহত্যার অভিযান।

সার-সংক্ষেপ

১৯৭১ সালে ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এ ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হরতাল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বাধীনতার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে তিনি অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করেন। শেষ পর্যন্ত আলোচনা সমাপ্ত না করেই তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন—
- ক. ১৯৭১ সালের ১ মার্চ
- খ. ১৯৭০ সালের ১ মার্চ
- গ. ১৯৭০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি
- ঘ. ১৯৭১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি

২. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়—
- ক. পল্টন ময়দানে
- খ. রেসকোর্স ময়দানে
- গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
- ঘ. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

৩. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন—
- ক. ২৫ মার্চ
- খ. ২৬ মার্চ
- গ. ২০ মার্চ
- ঘ. ২৪ মার্চ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ইয়াহিয়া খান _____ মার্চ এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ পাকিস্তানের ______ অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন।

২. _____ শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য _______ মার্চ ঢাকায় আসেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

২. ২০ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?

২. ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত - উত্তর প্রশ্ন

১. ৭ মার্চ ভাষণের মূল বিষয় কি ছিল?

২. ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো বৈঠক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বর আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক সেনাবাহিনী বাংলার নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এক নির্মম ও বর্বর গণহত্যার অভিযান পরিচালনা করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে রাতটি 'কালো রাত' নামে পরিচিত।

২.১ ২৫ মার্চের আক্রমণ ও গণহত্যা

পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দলবলসহ ঢাকা ত্যাগ করেন। তবে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে তাদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর নির্দেশ মতো (বেলুচিস্তানের কসাই নামে খ্যাত) গভর্নর টিক্কা খানের ঘাতক সৈন্যরা ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় গণহত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। রকেট, মর্টার, মেশিনগান ও কামানের মুহুর্মুহু শব্দে রাতের ঢাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঘাতকের নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় প্রধান আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জাম হোসেনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অধ্যাপক। এছাড়াও ২৫ মার্চ রাতের পাক-বাহিনীর আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, রোকেয়া হল, এস.এম. হল এবং জগন্নাথ হলের অনেক আবাসিক ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হন। বেরিক্যাড রচনাকারী জনতা, রেসকোর্স, মন্দির, নিরীহ পথচারী এবং নিঃস্ব বস্তিবাসীও এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ই.পি.আর ঘাঁটি এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ২৫ মার্চ রাতেই পাকবাহিনী দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা ও ডেইলি পিপলস পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়। নৃশংস গণহত্যার সংবাদ যাতে বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে আটক এবং তাদের সংবাদ প্রেরণের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ ২৫ মার্চ সেনা অপারেশনের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট'। এ অপারেশন ২৫ মার্চ শুরু হয় এবং ২৭ মার্চ পর্যন্ত গণহত্যা চলে। ক্রমান্বয়ে তা ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

২.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার ও স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ রাত ১:৩০ মিনিটে হানাদার সেনারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বাসভবন হতে গ্রেপ্তার করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের মীয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দি ছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসি'র প্রভাতি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা পাঠ করেন।

২.৩ স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচারিত হওয়ার পর মাতৃভূমিকে মুক্ত করার আশায় প্রবল শক্তিতে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলার ছাত্র-যুবক, নারী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল পেশাজীবী ও আপামর জনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হানাদারদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এভাবেই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ সালে প্রচারিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আবদুল হান্নান, মেজর জিয়ার ঘোষণার মূল ভিত্তি ছিল ২৬ মার্চের ঘোষণা। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীনতার পর সংবিধানে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘোষণার মাধ্যমেই একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়।

সার-সংক্ষেপ

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা সমাপ্তি ঘোষণা করেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। তবে যাত্রার পূর্বে তিনি যে নির্দেশ দেন সে মোতাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্ব পাকিস্তানে জঘন্যতম গণহত্যা সংগঠিত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এই ঘোষণার পর শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, যা কালক্রমে মুক্তি সংগ্রামে রূপ নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. বাংলার ইতিহাসে 'কালো রাত' নামে পরিচিত–
ক. ১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ রাত
খ. ১৯৭০ সালের ২৬ মার্চ রাত
গ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত
ঘ. ১৯১ সালের ২৬ মার্চ রাত

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের–
ক. মীয়ানওয়ালী কারাগারে
খ. করাচি কারাগারে
গ. সিন্ধু কারাগারে
ঘ. ইসলাবাবাদ কারাগারে

৩. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রথম প্রচার করেন–
ক. মীর শওকত আলী
খ. মেজর জিয়াউর রহমান
গ. এম এ হান্নান
ঘ. মেজর রফিকুল ইসলাম

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ঢাকায় আলোচনা সমাপ্ত না করেই ______ দলবলসহ ঢাকা ত্যাগ করেন।
২. ______ ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করেছিল।
২. এম এ হান্নান ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ প্রচার করেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ২৫ মার্চ পরিচালিত সেনা অভিযানের নাম কি?
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোথায় বন্দি ছিলেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ২৫ মার্চ গণহত্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু কিভাবে হয়।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও ১১টি সেক্টর সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আলোচনা করতে পারবেন।

৩.১ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এবং ১৭ এপ্রিল দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ এপ্রিল একটি অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এ সরকারই মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এসব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নতুন সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ১২ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৬ সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদ প্রচার করা হয়। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এক সভায় সরকার গঠন অনুমোদন করা হয়।

অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। তদানিন্তন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামে শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, কতিপয় নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ও কয়েক হাজার সাধারণ জনতার উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে তিনি একটি ঘোষণাপত্রও পাঠ করেন। এ ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়।

অস্থায়ী সরকারের সদস্য ও তাদের দফতর

নং	নাম	দফতর
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি
৩.	তাজউদ্দিন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী
৪.	খন্দকার মোশতাক আহমদ	পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী
৫.	এম. মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী
৬.	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা দানের জন্য আহ্বান

বৈদ্যনাথতলার ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। শত্রুর মোকাবিলা করে দেশকে মুক্ত করার জন্যও সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

৩.২ উপদেষ্টা কমিটি গঠন

ন্যাপ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অপর ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহ এবং কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর অস্থায়ী সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাদের সাথে আওয়ামী লীগের ৫ জন নেতাকে নিয়ে ৯ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি মুক্তিযুদ্ধকালে অস্থায়ী সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

৩.৩ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

স্বাধীনতার ঘোষণা দানের পর পরই পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের এ প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত, অবিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন। অস্থায়ী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে সংগঠন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়।

৩.৪ মুক্তিবাহিনী সংগঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। সরকারের নির্দেশে তিনিসহ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করেন। মুক্তিবাহিনী দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত ছিল- নিয়মিত বাহিনী ও অনিয়মিত বা গণবাহিনী।

নিয়মিত বাহিনী

তৎকালীন ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর) এর বাঙালি সদস্যদের নিয়ে সেনা ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়। ইপিআর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে 'সেক্টর ট্রুপস্' নামে আরেকটি বাহিনী গঠন করা হয়। সরকারিভাবে এই দুই বাহিনী নিয়মিত বাহিনী হিসেবে গণ্য হতো। উল্লেখ্য যে, নিয়মিত সেনা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে পরে তিনটি বিগ্রেড গঠিত হয়। মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের আদ্যক্ষর হিসেবে এই তিনটি বিগ্রেডের নামকরণ করা হয় যথাক্রমে এস-ফোর্স, জেড-ফোর্স ও কে-ফোর্স।

অনিয়মিত বা গণবাহিনী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবক, নারী, কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে গঠন করা হয় অনিয়মিত বাহিনী তথা ফ্রিডম ফাইটার্স বা গণবাহিনী। এই বাহিনী গেরিলা নামেও পরিচিত। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করত। নদী-নালা ও বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ পূর্ব বাংলায় গেরিলা যুদ্ধ নীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

৩.৫ অন্যান্য বাহিনী

সরকারের অধীনস্ত উপরোক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালীন আরও কয়েকটি বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এইসব বাহিনীর মধ্যে বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স, (বি.এল.এফ), টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী' এবং ভালুকার 'আফসার বাহিনী' উল্লেখযোগ্য। বি.এল.এফ ছিল একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। এই বাহিনী মুজিব বাহিনী নামেও পরিচিত। ছাত্র নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা, কর্মী ও শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। এই সব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কায়দায় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, বিএলএফ ও কাদেরিয়া বাহিনী কোনো সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এরা অস্থায়ী সরকারের আওতার বাইরে নিজস্ব পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

৩.৬ সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্তি

মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করেন।

সেক্টরগুলো ছিল:

সেক্টর নম্বর	এলাকা	কমান্ডারদের নাম ও সময়কাল
১.	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত	১. মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) ২. মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর)
২.	নোয়াখালী, কুমিল্লার আখাউড়া হতে ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ।	১. মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) ২. মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৩.	আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ।	১. মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) ২. মেজর নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৪.	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত।	মেজর সি আর দত্ত
৫.	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং ডাউকি ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত।	মেজর মীর শওকত আলী
৬.	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা।	উইং কমান্ডার এম. বাশার
৭	ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া জেলা।	১. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) ২. মেজর এম.এ.মনজুর (অগস্ট- ডিসেম্বর)
৮.	কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ ও খুলনার উত্তরাঞ্চল।	১. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) ২. মেজর এম এ মনজুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)
৯.	খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।	১. মেজর এম এ জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ) ২. মেজর জয়নাল আবেদিন (যুদ্ধের শেষ কিছুদিন)
১০.	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ, সমুদ্র উপকূল অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও চালনা।	হেড কোর্য়াটার পরিচালিত নৌ-কমান্ডারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশে কাজ করতেন
১১.	কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।	১. মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর) ২. এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

৩.৭ মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতা

প্রথম দিকে (জুলাই পর্যন্ত) মুক্তিবাহিনীর অভিযান তৎপরতা কিছুটা মন্থর গতিতে চলে। আগস্ট মাস হতে তৎপরতা দ্রুততর হয়। এ সময় মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও আক্রমণ পরিচালনা করে রংপুর ও ময়মনসিংহের বিস্তৃত এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

৩.১৩ পাকিস্তান সরকার, শান্তি কমিটি, রাজাকার ও অন্যান্য বাহিনী গঠন

মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রহসন করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট গণধিকৃত গভর্নর টিক্কাখানের স্থলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিককে নিয়োগ দেন। ডা. মালিকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়। জাতীয় পরিষদের ৭৯ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৪ জন সদস্যের সদস্য পদ ইচ্ছামত বাতিল করে প্রহসনের উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদে সদস্য বাছাই করা হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ এবং হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতাদানের জন্য ‘রাজাকার’, ‘আলবদর’ ও ‘আল শামস্’ প্রভৃতি বাহিনী গঠন করা হয়। আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী মূলত জামাত ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এছাড়া ধর্মভিত্তিক দল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, পিডিপি এসব বাহিনীর সদস্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ব্যক্তিবর্গ এবং পূর্ব বাংলায় বসবাসরত অবাঙালিরা এসব বাহিনীতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

সার-সংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা, পরবর্তীতে স্বাধীনতা ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এ সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সার্বিক যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মিত গেরিলা বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সহযোগী হিসেবে রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী গঠন করে। অবশ্য এর দ্বারা মুক্তি পাগল দেশপ্রেমিক মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করা যায় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালে–
- ক. ১০ এপ্রিল
- খ. ১১ এপ্রিল
- গ. ১৩ এপ্রিল
- ঘ. ১৭ এপ্রিল

২. অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন–
- ক. অলি আহাদ
- খ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
- গ. নূরুল আমিন
- ঘ. খন্দকার মোশতাক আহমদ

৩. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন–
- ক. কর্নেল আঃ রব
- খ. জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী
- খ. শেখ মুজিবুর রহমান
- ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে মেহেরপুরের ______ গ্রামে।
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র রণাঙ্গনকে ______ টি ______ বিভক্ত করা হয়।
৩. জিয়াউর রহমানের নামের অধ্যাক্ষর অনুযায়ী ______ গঠন করা হয়েছিল।

গ. সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন

১. সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রতি ছিলেন।
২. কমরেড মোজাফফর আহমদ অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।
৩. ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে অপসারণ করে ডা. মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
২. কার নামের অদ্যাক্ষর অনুযায়ী জেড-ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
৩. মেজর জিয়াউর রহমান কোন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কখন ও কোথায় গঠিত হয়েছিল?
২. দপ্তরসহ অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের নাম লিখুন।
৩. সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সহযোগিতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, মুক্তিবাহিনী ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। নভেম্বর মাসের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হয়। এ সময় প্রচলিত কায়দায় যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা আক্রমণের মধ্যদিয়ে মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। প্রচণ্ড আক্রমণে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে।

৪.১ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বজনীন গণযুদ্ধ। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, ডাক্তার, উকিল, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এক কোটি বাঙালি এবং আদিবাসী নাগরিক প্রতিবেশী ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা সেখানে থেকেই নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিদেশীদের সমর্থন আদায় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রদানকারী ভূমিকা পালন করে। মস্কোপন্থী বাম রাজনৈতিক দলসমূহ ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে পিকিংপন্থী কিছু বাম দল ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ স্বাধীনতা সংগ্রামে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে নি। এর কারণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি গণচীনের বিরোধিতা। কয়েকটি ডানপন্থী দল যেমন- জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা এবং ইয়াহিয়া সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে।

৪.২ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশী ভারত, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পৃথিবীর অনেক দেশের সরকার ও জনগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের প্রায় এক কোটি নারী-পুরুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের সরকার ও জনগণ বাঙালি শরণার্থীদের ভরণ-পোষণসহ সবধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছিল। ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দান করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি তাদের অন্ধ সমর্থন দান করেছিল। তবে এসব দেশের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতিশীল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

৪.৩ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। প্রায় এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা-চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ দেশের অন্যান্য স্থানে হানাদার বাহিনীর উপর তীব্র আঘাত হানতে থাকে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর অভিযান ব্যাপক ফলপ্রসূ হয়। এসময় দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। ক্রমান্বয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলও মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিতে থাকে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত পাক-বাহিনী ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আকস্মিকভাবে ভারতের অমৃতসর শ্রীনগরসহ অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করলে ৪ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাঠায়। ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতীয় মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী একত্রে যৌথ বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। ভারতীয় বিমান ও নৌ-বাহনীও পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর সেনানিবাস, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১০ ডিসেম্বর বিমান হামলা বন্ধ রেখে বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথবাহিনী ভৈরব, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল মুক্ত করে ঢাকার খুব নিকটে চলে আসে।

৪.৪ ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যৌথবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে যায় এবং ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকায় হামলা শুরু করে। এমতাবস্থায় ১৪ ডিসেম্বরই গভর্নর মালিক ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ করেন এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস সৃষ্ট 'নিরপেক্ষ জোন' হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। এরূপ একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল্-শামসদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরেক দফা গণহত্যা চালায়। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকসহ বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ দিনটি একটি মর্মান্তিক দিন। একারণেই ১৪ ডিসেম্বর দিনটি 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

৪.৫ পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ দুর্বার আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আত্মসমর্পণ ব্যতীত বিকল্প কোন পথ না পেয়ে বিপর্যস্ত পাক-বাহিনী ১৫ ডিসেম্বর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিন বিকাল ৪ টা ১৯ মিনিটে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ ভারতীয় ইস্টার্ন কামান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজী পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ যে, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

৪.৬ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নাম ধারণ করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানী এবং লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলার জনগণ লাভ করে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও একটি স্বাধীন পতাকা।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বজনীন গণযুদ্ধ। জামাত ইসলামী, মুসলীম লীগ, রাজাকার, আলবদর, আল-শাসস

ইত্যাদি অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী এবং বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সমাজের সর্বস্তরের লোক প্রত্যক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ বিশ্বের কিছু দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বটে, তবে সেসব দেশের সাধারণ মানুষ এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকার ও জনগণ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হয়। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী একত্রে যৌথ কমান্ড গঠনের ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দান করে—
   ক. ভূটান খ. ভারত
   গ. মালদ্বীপ ঘ. ইরাক

২. আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে পাক-বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে—
   ক. ১২ ডিসেম্বর খ. ১৪ ডিসেম্বর
   গ. ১৩ ডিসেম্বর ঘ. ১৫ ডিসেম্বর

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বজনীন ______।
২. ৬ ডিসেম্বর ______ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ______ স্বীকৃতি দেয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা করেছিল।
২. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণকারী ইস্টার্ন কামান্ডের প্রধানের নাম কি?
২. ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কে উপস্থিতি ছিলেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের বিবরণ দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৬

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সমন্ধে আলোচনা করুন।
২. ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি আলোচনা করুন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনমনে এ ঘোষণার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৩. মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা-প্রবাহ আলোচনা করুন।
৪. পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।